Deba Prasad Das

বম্বের সেই সব সোনাঝরা দিন

বম্বে টকিজের ' মশাল ' ছবিতে গান গাওয়ার পর থেকে বম্বেতে আমার ভাগ্যের চাকাটাই রাতারাতি যেন একেবারে ঘুরে গিয়েছিল। মশাল ছবির সেই ' উপর গগন বিশাল' এবং' দুনিয়াকে লোগো লো হিম্মৎ সে কাম " গান দুটো তখন খুব হিট হয়ে গেল।তখনো তো ক্যাসেট প্লেয়ার যন্ত্রটা আজকের মতো একেবারে পান- বিড়ির মতো পর্যায়ের পণ্য হয়ে ওঠেনি , তা সত্ত্বেও এখানে - ওখানে সর্বত্র তখন লোকেদের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো সেই গান '' উপর গগন বিশাল "। কিন্তু এটা যে একটা হুজুগ বা by chance লেগে গিয়েছিল , তা কিন্তু নয়।সত্যিই একটা মারভেলাস গান হয়েছিল ওটা। যেমন ভালো গান লিখেছিলেন প্রদীপজী , তেমনই beautiful সুর করে ছিলেন শচীন দা। আমার তো মনে হয় সিনেমায় না হয়ে ওটা যদি বেসিক সঙ্ হিসেবেও গাওয়া হত , তাহলে ও গানটা বোধহয় এর চেয়ে কম জনপ্রিয় হত না। কী গভীর ব্যাঞ্জনাময় এর কথা , কি ব্যাপ্তি এর সুরের বিচরণে আহাঃ ! গানটা গাইলেই কথায় সুরে হৃদয়টা যেন এত্তবড় হয়ে যায়। কথা ও সুরের এই যে অপূর্ব মেলবন্ধন , এই মেলবন্ধনই নিঃসন্দেহে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পেরিয়েও এই গানকে আজও সদ্য তোলা গোলাপের মতোই একেবারে জীবন্ত করে রেখেছে। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে কয়েকবছর আগে ওয়েষ্ট ইন্ডিজে আমার একটি musical recital এর কথা।ওখানে একটি অনুষ্ঠানে আমি যখন এই গানটা গাই, তখন একজন ইংরেজ মহিলা এসে আমায় বল্লেন,- এই গানটা আমার খুবই ভালো লাগছে , আমি গানের কথাগুলো লিখে নিতে চাই। আমি বল্লাম - সে কী ! আপনি হিন্দী বোঝেন ! উনি বল্লেন ,- না, গানের মানেটাও আমাকে ইংরেজীতে বলে দিন। আমি তখন ওকে হিন্দীতে গানের কথাগুলোও বল্লাম এবং সেই সঙ্গে ইংরেজীতে সেটার অর্থটাও বলে দিলাম। কিন্তু গানটার অর্থ শুনে উনি যা বল্লেন, শুনে আমি তো একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ভদ্রমহিলা বল্লেন ,- ''আপনার কাছে এই গানটার অর্থটা জেনে নেয়ার সুযোগ না পেলেও আমার বোধ হয় তেমন কোন ক্ষতি হত না।নিজের মতো করে ঐরকমই একটা অর্থই আমি মনে মনে করে নিয়েছি। কারণ হিন্দী না বুঝতে পারলেও আপনার গাওয়া

শুনে practically ঐরকমই একটা ভাব আমার মনে এসেছিল।"

হিন্দী ফিল্মীগানের ইতিহাসে যে পিরিয়ডটাকে স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত করা হয়, সেই পিরিয়ডের একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ছিলেন শচীনদা অর্থাৎ শচীনদেব বর্মন, সুরকার তথা শিল্পী হিসেবে শচীনদা তো নিঃসন্দেহে খুবই উঁচুমার্গের ছিলেনই, মানুষ হিসেবেও শচীনদা ছিলেন অতুলনীয়। খুবই সাধাসিধে প্রকৃতির লোক ছিলেন উনি। আমি যখন ওঁর সহকারী হিসেবে কাজ করতাম, তখন দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতাম যে, এক একটা গানকে কি করে একেবারে মায়ের মমতা দিয়ে তিল তিল করে উনি গড়ে তুলতেন। একটা লাইনের সুর করেই জিজ্ঞেস করতেন,- "কিরে ক্যামন লাগসে?" হয়তো বল্লাম,- " বাঃ খুব সুন্দর হয়েছে সুরটা।" উনি আবার বলতেন - " ভালো লাগসে ? সত্যিই খুব ভালো লাগসে রে ? " বলতাম,- হ্যাঁ, সত্যিই খুব ভালো লাগছে। এই করে করে একটা একটা লাইনকে নিয়ে ওভাবে ঘষামাজা করতে করতে শেষ পর্যন্ত গানটার যে রূপ হত beautiful, শুধু শচীনদাই নয়, তখনকার দিনে প্রত্যেক music director ই ঐ রকম যত্ন করে এক একটা গানকে embellish করতেন। তবেই না জন্ম নিত ঐরকম land mark গান। এবং যেহেতু প্রত্যেকের কাজ করার ধারা, চিন্তা করার ধারাটাই ছিল স্বতন্ত্র, তাই তাদের গান শুনলেই বলে দেয়া যেত এটা ওমুকের গান, ওটা তমুকের গান। সুরের চলনের মধ্যেই তারা এমন একটা অদৃশ্য stamp রেখে দিতেন, যা দিয়ে গান শুনলেই চোখ বন্ধ করেও একজনের গান থেকে অন্যজনের গানের পার্থক্য স্পষ্ট চিনতে পারা যেত।

শচীনদার সুরে বহু ছবিতেই আমি গান গেয়েছি এবং সেই সব গান প্রত্যেকটাই প্রায় হিটও হয়েছে। ওনার সুরে ' দেবদাস' ছবিতে আমার ও গীতাদত্তের গাওয়া দ্বৈতগীত - ' আন মিলো শ্যাম সাঁবরে ' পঞ্চাশ দশকের খুবই হিট গান ছিল। এছাড়া ' মেরি সুরত তেরি আঁখে ' ছবির বিখ্যাত গান ' পুছোনা ক্যায়সে ম্যায়নে রৈন বিতাই, ' তালাশ ' এর ' খোই খোই আঁখে হ্যায় ', ' মঞ্জীল ' এর ' হটো কাহে কো ঝুটি বনাও বতিয়া ', ইত্যাদি আমার জীবনের বহু বিখ্যাত গানেরই জনক ছিলেন শচীনদা। ওনার সুরকরা আর একটি গান গেয়েও আমি নিজে তখন খুবই তৃপ্তি পেয়েছিলাম। গানটি ছিল,- "মেরে সব কুছ মেরে গীতরে, গীত বিনা কৌন মেরা মিতরে '। কি অপূর্ব গান। কি সুন্দর কথা - গানই হচ্ছে আমার কাছে সব কিছু, গান ছাড়া better বন্ধু আর কে আছে আমার!! একেবারে যেন আমার নিজের মনের কথাটাই লিখেছিল আনন্দ বক্সীজী। খুবই প্রাণ ঢেলে গেয়েও ছিলাম গানটা। কিন্তু গানটার যেরকম picturisation হ'ল, দেখে সত্যি সত্যিই সেদিন আমি একেবারে কেঁদে ফেলেছিলাম। মনে হয়েছিল প্রকাশ্য দিবালোকে চৌরাস্তার মোড়ে কে যেন গানটাকে সেদিন খুন করে গিয়েছিল। অমিতাভ, রাজেশ খান্না বা ধর্মেন্দ্রর মতো হিরোর মুখে গানটা দিলে পর সেটার যে একটা অন্যরকম রূপ হত,

কদর হত , সেটাই কিনা হসপিটালের মধ্যে একটা second lip এ গিয়ে পড়ে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ল ! জঘন্য! এত ভালো একটা গান, অথচ সেটার কোন কদরই হল না , লোকের কাছে সেগান সেভাবে পৌঁছাতেই পারলো না ।

হিন্দী গানের জগতে আজ আমার যতটুকু যা পরিচিতি, সেই পরিচিতির পেছনে শঙ্কর - জয়কিষেন জুটি , বিশেষত শঙ্করজীর অবদানই আমার জীবনে সবচেয়ে বেশী । ওর contribution কোনদিনই আমি repay করতে পারবো না । বম্বেতে তো বহু সংগীত পরিচালকের সাথেই আমি অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে তখন কাজ করেছি বা বহু সংগীত পরিচালকের সাথেই তখন আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল , কিন্তু সেই অর্থে তারা কেউই সেভাবে আমার গায়ক সত্বাটাকে তুলে ধরতে পারে নি বা ধরতে চায়নি । এমনকি শচীনদাও তখন আমাকে একজন full fledged singer হিসেবে ভাবতে পারেননি । কখনোই বলেননি যে আজ থেকে তুই আমার সব ছবিতে গান গাইবি । সেই break টাই আমাকে দিয়েছিল শঙ্করজী । শঙ্করই প্রথম ভাবলে যে এই হচ্ছে একজন polished singer এবং এর গলার যে টিম্বার , তাতে একে দিয়েই পুরুষ মানুষের প্রেমের গান তো করানো যায় । প্রেমের গান মানেই সব সময় সেই একেবারে নেতিয়ে পড়া কেন ! পুরুষ মানুষ যেভাবে প্রেম করে , যেভাবে প্রেমিকার সাথে কথা বলে , আর পাঁচজনের সাথে কথা বলে , সেভাবে পুরুষ মানুষের গান কেন হবে না !! একে দিয়ে আমি সেই কাজটাই করাবো । এবং তখনই শঙ্কর আমাকে দিয়ে একের পর এক এমন সব গান গাওয়াতে লাগলো , যে গান শুধু যে শ্রোতাদেরই ভালো লাগলো তাই নয় অন্যান্য মিউজিক ডাইরেক্টররাও তখন ভাবতে বাধ্য হল যে মান্না দে ছাড়া এই গান এভাবে কেউ গাইতে পারতো না । তখনই তারাও আমাকে দিয়ে গান গাওয়ানোর কথা নতুন করে ভাবতে লাগলো । I am grateful to Shankar Jaikishen for that রোমান্টিক গান, ভালো ভালো feelings এর গান ,ছেড়ে ছাড়, লঘু শাস্ত্রীয়গীত মানে এককথায় গানের যত রকম রঙ হতে পারে , যত রকম flavour হতে পারে শঙ্কর আমাকে দিয়ে তখন সমস্তই গাইয়ে ছিল । আজ যে লোকেরা বলে যে Manna Dey is a versatile singer ,সেই versatility টা শঙ্কর জয়কিষনই প্রথম prove করে দিয়েছিল ।

শঙ্কর -জয়কিষেনের সুরে আমি প্রথম গান গেয়ে ছিলাম **বোধহয়** রাজকাপুরের বিখ্যাত ছবি 'আওয়ারা 'তে। শৈলেন্দ্রজীর লেখা আমার আর লতার সেই ডুয়েট গান , -"তেরে বিনা আগ ইয়ে চান্দনি ।" সেই শুরু । বোধহয় এটা ১৯৫১ সনের কথা । এরপর আমাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি কোন দিন । বুট পালিশ , শ্রী ৪২০, চোরিচোরি , উজালা , মেরে হুজুর ইত্যাদি ইত্যাদি কত ছবি , কত গান । আর গান মানে কি এমন সুর করত যে লোকে বাধ্য হত চলতে ফিরতে আনমনে সে সব গান গুন গুন করতে। 'প্যার হুয়া ইকরার হুয়া ,' ' দিলকা হাল শুনে

দিলওয়ালা , ' এসব গানের মজা এত সহজে ভোলো যায় ! শঙ্কর-জয়কিষেন এমন একটা জুটি যারা জীবনে কোন দিন একবগ্গা সুর করেনি। Always they had an inquisitive mind for new creation .সেকারণেই আজও ওরা অমর, সেকারণেই কুড়ি-পঁচিশ বছর একটানা একই ভাবে ওরা এভাবে ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রিতে রাজত্বকরে যেতে পেরেছে। আমার জীবনে শঙ্করের contribution কোনদিনই আমি ভুলতে পারবো না। গানের জগতে আমি যে কৃষ্ণচন্দ্র দের প্রতিনিধি নই , কৃষ্ণচন্দ্র দের বিকল্প কন্ঠ নই , আমার নিজেরও একটা distinct identity আছে শঙ্কর জয়কিষনই সেটা ইন্ডাষ্ট্রিতে দেখিয়ে দিয়েছিল। এর আগে যত ছবিতে যত যা-ই গান আমাকে দিয়ে গাওয়ানো হয়ে থাকুক না কেন , সেটা practically কাকার representative হিসেবেই আমাকে দিয়ে করানো হয়েছিল। আমি তখন পঁচিশ - তিরিশ বছর বয়সের একজন টগবগে যুবক অথচ playback করতে হত কিনা বাল্মীকি , দাড়িওয়ালা বুড়ো ফকির, যতসব বুড়ো দের জন্য। খুব দুঃখ হত মনে মনে সে সময়। সিনেমায় নতুন প্লেব্যাক করছি , বন্ধু-বান্ধবীদের কে সে সব সিনেমা দেখানোর ,আমার গান শোনানোর একটা অত্যুগ্র বাসনাতো মনে মনে হ'ত, কিন্তু কি দেখাবো , কি শোনাবো বান্ধবীদের কে ,! ঐ সব বুড়ো বুড়ির গান ! লজ্জায় বলতামই না ওদের কে কবে কোন ছবিতে আমি playback করছি , কি করছি। এর চেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে ! Shankarji did help me in a great way in coming out from that .

শঙ্কর জয়-কিষেনের সাথে 'আওয়ারা 'তে কাজ করার সময়ই রাজকাপুরের সাথে আমার পরিচয়। আগেও ওকে চিনতাম ঠিকই , কিন্তু সে ভাবে বন্ধুত্ব তখনও গড়ে উঠে নি , যেটা 'আওয়ারা 'তে কাজ করার পর হয়েছিল। এর পর তো 'চোরিচোরি','একদিন রাত্রে ',' বুট পালিশ,' ' শ্রী ৪২০' ,'তিসরি কসম ', 'খান দোস্ত', 'ববি', ইত্যাদি ইত্যাদি বহুছবিতেই ওর সাথে আমি কাজ করেছি। He became a well wisher of mine. হিন্দি ফিল্মের ইতিহাসে উনিতো জীবন্ত কিংবদন্তী হয়ে গিয়ে ছিলেন। ঐ রকম dedication , ঐরকম লগন নিয়ে কটা লোক এসেছে এই ইন্ডাষ্ট্রিতে ! এদের সাথে কাজ করা , এদের জন্য গান গাওয়া জীবনের সে এক অমূল্য অভিজ্ঞতা। আমি যখন শঙ্কর জয়- কিষেনের সুরে 'মেরা নাম জোকার ' ছবিতে ওর জন্য ঐ 'এ ভাই জরা দেখকে চলো , আগে হি নেহি পিছে ভি ....'' গান টা গাই , তখন রিহার্সাল থেকে শুরু করে রেকর্ডিং পর্যন্ত সমস্ত সময় রাজ সাহেব আমার সাথে সাথে ছিলেন। যখন গান টার রিহার্সাল তখন বারবার উঁনি আমাকে মনে করিয়ে দিতেন , - মান্নাদাদা , এক জোকার কি জিন্দেগী কী tragic feelings গা রহে হ্যাঁ আপ,এ্যায়সে গাইয়ে য্যায়সে কোই . কিসিকো বাঁতো বাঁতোমে কহতা হ্যায় কি - এভাই , জরা দেখকে চলো , আগে হি নেহি পিছে ভি.....। য়ু গাইয়ে দাদা। এই করে করে গানের appeal টাকেই একেবারে বদলে

দিতেন। তারপর গান টা যখন রেকর্ড করছি ,স্টুডিওর কাঁচের দেওয়ালের ওপাশে দেখি আমার ঠিক সামনে উনি অভিনয় করে করে নেচে নেচে গানের সঙ্গে লিপ মেলাচ্ছেন। চোখের সামনে গানের ঐরকম জীবন্ত picturisation দেখতে দেখতে অটোমেটিক্যালিই গানের অন্য রকম একটা মুড এসে যেত। সে কারনেইঐ সমস্ত গান এত হিটও হত সে সময়। আসলে ওরা জানতো কি করে একজন artist এর ভেতর থেকে cream টা বের করে আনতে হয় , কি করে character যে demand করছে সেটা artist কে দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। তবে না জন্ম নিয়েছে ওরকম প্রাণবন্ত সব গান। তখন গান বাজনার পুরো মহলটাই ওরকম ছিল। প্রত্যেকটা গানের পেছনে একটা serious team work কাজ করতো। কেউই একক ভাবে demand করতে পারতো না যে এটা একমাত্র তারই credit . গীতিকার , সুরকার, শিল্পী , অভিনেতা, যন্ত্রী প্রত্যেকের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ ঢালা involvement এ-ই গড়ে উঠতো ঐ রকম এক একটা গান। সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে যেমন বলা হয় যে উনি যেকোন শিল্পীকে দিয়েই ওনার চাহিদা মতো অভিনয়টি করিয়ে নিতে পারতেন , ফিল্মী গানের ক্ষেত্রে রাজ সাহেব সম্পর্কেও বোধহয় সেই একই কথা সমান ভাবেই প্রযোজ্য । এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে গেল 'সত্যম শিবম সুন্দরম ' ছবির একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা। সেদিন টেক হচ্ছিল ঐ ছবিতে লতামঙ্গেশকারের গাওয়া 'যশোমতী মাইয়া সে বোলে নন্দ্লালা ' গানটার , যেটায় লিপ দিয়েছিল পদ্মিনী কোলাপুরী। গানটায় আমারও একটু গলা ছিল বলে আমিও তখন স্টুডিওতেই ছিলাম। লতা বাঈয়ের ঐ ভগবান দত্ত কন্ঠ, তার বিকল্পহীন গায়কীর তো কোন তুলনা হয়না। ঐ দিনও খুব দরদ দিয়েই উনি গাইলেন - ' যশোমতী মাইয়া সে বোলে নন্দ্ - লালা'। প্রথম টেকটা হয়ে গেল। লতাবাঈ নিজেও খুব খুশি গানটা গেয়ে , আমরাও খুব বলাবলি করছি- বাঃ, খুব সুন্দর হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু রাজ সাহেব বল্লেন , -" লতাজী গান তো এমনি তে আপনি ঠিকই গেয়েছেন , কিন্তু পদ্মিনীর লিপে তো এ গান মানাবে না।" যখনকার কথা বলছি পদ্মিনী তখন খুবই ছেলে মানুষ ,বয়স বড় জোর বার- তের মতো হবে। ফ্রক পরেই এখানে- ওখানে সারা স্টুডিওতে ও তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওকে দেখিয়ে রাজ সাহেব বল্লেন ,-ওর যে বয়স , তাতে ওর লিপে তো আপনার এই গান খাপ খাবে না লতাজী। রাজ সাহেবের কথা শুনে লতা খুব গম্ভীর হয়ে গেল। আমরাও ভাবছিলাম যে বয়সের এই পার্থক্য , তো আমরা শিল্পীরা এব্যপারে কি করতে পারি ! কিন্তু আমরা বা লতাবাঈ কেউই মুখে রাজ সাহেবকে কিছুই বল্লাম না। একটু পরেই পদ্মিনীকে আদর করে কাছে ডেকে নিয়ে লতা বল্লেন , - "এই তুই আমার গানটা শুনেছিস !" ও বল্লে- হ্যাঁ। লতা বল্ল - গা তো দেখি। পদ্মিনী তখন এতক্ষন যা শুনেছে , ওর কিশোরি গলায় হুবহু তাই গেয়ে দিল। লতা বল্লে - ঠিক আছে যা । তুই গিয়ে খেলা কর। বল্লে

বিশ্বাস হবে না এর পর লতা যখন গান টা দ্বিতীয় টেক করলো , আমরা সবাই শুনে একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এ কি ! মনে হচ্ছে যেন লতা নয় সত্যি সত্যিই পদ্মিনী কোলাপুরী গাইছে। সেই জ্বালা , সেই বয়সের ছাপ গানটার সর্ব্বাঙ্গে। রাজসাহেব তো এইটেই চাচ্ছিলেন, আনন্দে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন লতাকে। অন্য কেউ হলে হয়তো এভাবে চিন্তাই করতো না এতো গভীরে। লতা মঙ্গেশকর গাইছেন , ওর গানের ওপর আবার কথা কি ! কিন্তু রাজ সাহেব সেইটেই করলেন। একজন artist এর ভিতর থেকে perfect জিনিসটা বের করে আনা , ওটা রাজ সাহেবের মতো মানুষের পক্ষেই সম্ভব। এবং লতার মতো শিল্পীর পক্ষেই বোধহয় সম্ভব পরিচালকের চাহিদা সেই জিনিস টা করে দেখিয়ে দেয়া। রাজ সাহেবের গানের সেন্স যে কত প্রখর যে ছিল , গানের picturisation এর সেন্স যে কত perfect ছিল , সে আমি প্রত্যেক পদে পদে বার বার অনুভব করেছি। ' দিল হী তো হ্যায় ' ছবিতে রোশনের সুরে আমার একটা গান ছিল 'লাগা চুনরিমেঁ দাগ ছুপাউ ক্যায়সে ......'। গানটায় লিপ দিয়েছিলেন রাজ সাহেব নিজেই। গানটায় উনি যে ভাবে লিপ দিয়েছিলেন , বিশেষত শেষের দিকে ঐ তারানা পর্যায়ে যে ভাবে এত নিখুঁত ভাবে উনি ঠোঁট মিলিয়েছিলেন , দেখে নিজের চোখকেই আমি যেন সেদিন বিশ্বাস করতে পারিনি। একমাত্র উত্তম-কুমার ছাড়া ওরকম সুন্দর লিপ মেলাতে আর কাউকেই কোনদিন দেখেনি।

উত্তম কুমারের কথা বলতেই বম্বেতে একদিনের একটা ঘটনার কথা বিশেষ করেই আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বোধহয় সেটা '৬৫ কি '৬৬ সনের কথা। আমি তখন বান্দ্রাতে থাকতাম। উত্তম বাবু তখন বম্বেতে 'ছোটি সি মুলাকাত ' এবং কলকাতায়' 'এন্টনী ফিরিঙ্গি' দুটো ছবির কাজই যুগপৎ পাশাপাশি করছিলেন। 'এন্টনী ফিরিঙ্গি 'তে অনিল বাগচী তখন উত্তমের জন্য 'আমি যে জলসা ঘরে , ' 'চম্পাচামেলী গোলাপেরই রাগে ' ইত্যাদি অনেক গুলো অন্যরকনের গান আমাকে দিয়ে করিয়ে ছিলেন। একদিন হল কি , অন্য কি একটা ছবির রেকর্ডিংয়ের ব্যাপারে সেদিন আমার একটু তাড়া ছিল বলে গাড়ী নিয়ে বেশ সকাল সকালই সেদিন আমি স্টুডিওর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা। একটু এগোতেই হঠাৎ সামনে দেখি উত্তম কুমার এধার থেকে ওধারে রাস্তা ক্র শ করছেন। গাড়ী থামিয়ে বল্লাম , -" কি ব্যাপার উত্তম বাবু এখানে কি করছেন আপনি এই সকালবেলায় ?" উনি হেসে বল্লেন , - "এই একটু morning walk এ বেরিয়ে ছিলাম।" বলেই সামনের অ্যাপার্টমেন্টটা দেখিয়ে বল্লেন -" আমিতো এখানেই উঠেছি এবার মান্না দা।" আমি বল্লাম , -" কিন্তু আপনার হাতে ওটা কাগজে মোড়া কি ? " বল্লেন ,- "এই দেখুন না টেপ রেকর্ডারে আপনার গান নিয়ে ঘুরছি সারাক্ষণ। কি সব ছোটি ছোটি কঠিন কঠিন জিনিস করে দিয়েছেন গানের মধ্যে , তাতেই ফেঁসে গেছি। শুনে শুনে খালি গেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কিছুতেই

Deba Prasad Das

আসছে না।"ওঁর কথা শুনে সেদিন আমার খুবই ভালো লেগে ছিল। মানে উনি চেষ্টা করছেন গায়ক যে ভাবে গানটা গেয়েছেন , টেপ শুনে শুনে সেই ছোটি ছোটি কাজগুলোকে পর্যন্ত ছুঁয়ে যেতে । কতটা গভীর ভাবনা চিন্তা , কতটা ডেডিকেশন থাকলে পর একজন আর্টিস্ট এটা করতে পারে , ভেবে সেদিন আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়ে ছিলাম। পরে অন্যদের মুখেও আমি শুনেছি যে যখনি ছবিতে ওঁর লিপে কোন গান থাকতো , তখন বাড়ীতে বাথরুমে ,লাইব্রেরীতে খালি গলায়েই হোক বা ড্রইং রুমে হারমোনিয়াম নিয়ে বসেই হোক সর্ব্বত্র সবসময় ঐ গান প্র্যাকটিশ করতে করতে উনি নাকি সারা বাড়ী একেবারে মাথায় করে তুলতেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, আমার গাওয়া গান গুলোই যখন সিনেমাতে উত্তম বাবুর মুখে আমি দেখতাম, তখন নিজেরই মাঝে মাঝে সন্দেহ হত যে গান গুলোতে উত্তমবাবু লিপ মেলাচ্ছেন নাকি নিজেই সত্যি সত্যি গাইছেন। আমারই গাওয়া গান , অথচ কোথাও এত টুকুও খুঁত ধরতে পারিনি কোন দিন। মনে হত যেন , উত্তম বাবুই সত্যি সত্যিই গানটা গাইছেন। Really Uttam babu was a great artiste indeed , ওর অভাব কোনদিনই বোধহয় আর পূর্ণ হবার নয়।

আমার জীবনে শঙ্কর - জয় কিষেনের অবদান যদিও খুবই উল্লেখনীয় ঘটনা ,যদিও শঙ্কর জয় কিষেনই সেই অর্থে আমাকে প্রথম full fledged singer এর স্বীকৃতি দিয়েছিল , কিন্তু পাশাপাশি সলিল চৌধুরীর , অনিল বিশ্বাস ,নৌশাদ জী , বসন্ত দেশাই, রোশন মদন মোহন কল্যানজী- আনন্দ জী , শ্রীরাম চন্দ্র , অবিনাশজী লক্ষীকান্ত - প্যারেলাল , জয়দেব এস. এন .ত্রিপাঠি , দত্তারাম প্রমুখ সংগীত পরিচালকদের ভূমিকাও আমার জীবনে কোন অংশে কম গুরুত্ব পূর্ণ নয়। এদের প্রত্যেকের সুরেই বহু ছবিতে বহু ধরনের অজস্র গান আমি গেয়েছি এবং সেসব গানও আমার সংগীত জীবনের এক একটি মাইলস্টোন হিসেবে স্মৃতি চিহ্নিত হয়ে আছে। জনমানসে আজ আমার যতটা যা পরিচিতি , যতটা যা সম্মান , এর পেছনে এই সব দিকপাল সংগীত ব্যক্তিত্ব দের অবদান এককথায় অপরিসীম। এদের প্রত্যেকের গানের মধ্যে যে একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট , যে একটা স্বতন্ত্র approach থাকতো সেগুলো গাইতে আমার খুবই ভালো লাগতো। এবং শুধু সুরের জগতের ভালোলাগাই নয় , ইন্ডাস্ট্রির বাইরে আমার ব্যক্তিজীবনেও এদের প্রত্যেকের সাথেই আমার তখন খুবই ভালো বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে ছিল। কালের স্রোতে হয়তো সেইসব কিছু কিছু স্মৃতি ধীরে ধীরে আজ ম্লান হয়ে গেছে , আবার কিছু কিছু স্মৃতি যেন আজও ঠিক সেই সেদিনের মতো অম্লান। হয়তো স্মৃতির ধর্মই এই। সে কারোর ভালো মন্দের কোন পরোয়াই করে না কোন দিন। যে কারনেই অনেক মূল্যবান ঘটনাও কত সহজেই মন থেকে একদিন অচিরেই মুছে যায় , আবার কত ঠুনকো ঘটনা শতচেষ্টা করেও মন থেকে কোন দিন মুছে ফেলা যায় না। স্মৃতি তার নিজের খেয়ালেই এগিয়ে যায় চিরকাল

সেখানে ইতিহাস খুঁজতে যাওয়ার কোন অর্থ হয়না।

সুরকারদের মধ্যে প্রথমেই খুব মনে পড়ছে বন্ধুবর সলিল চৌধুরীর কথা। সলিল বাবুর সাথে আমার বন্ধুত্ব সে আজ প্রায় চল্লিশ বছরের কথা। ৫৩ সাল নাগাদ বিমল রায়ের ছবি ' দো বিঘা জমিন' এর সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে সলিলবাবু যখন কলকাতা থেকে বম্বে এলেন , তখনই ওনার সাথে আমার পরিচয়। গীতিকার শৈলেন্দ্রজীর লেখা ঐ গান ' ধরতি কহে পুকার কে ' এবং 'হরিয়ালা সাঁওন ঢোল বজাতা আয়া ', যেটা লতা আর আমি ঐ ছবিতে ডুয়েট গেয়েছিলাম , তাতে সলিলবাবু যে বিউটিফুল সুর করেছিলেন সুর শুনেই at once I fell in love with him . ঐ গানে folk notes এর সাথে western style মিলিয়ে উনি যে একটা অন্যরকম সুর করেছিলেন , শোনামাত্রই আমার সেদিন মনে হয়েছিল যে বম্বে ইন্ড্রাস্ট্রিতে এমন একটা rare প্রতিভার জন্ম হল , যার প্রতিভায় সারা ইন্ড্রাস্ট্রি একদিন প্রতিভাত হবে। এবং practically অচিরেই হয়েও ছিল ঠিক তাই। সলিল চৌধুরী মানে আমার কাছে শুধুই একজন সংগীত পরিচালকই নয় , সলিল চৌধুরী মানে যেন একটি dynamic institution . May be জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে উনি ঠিক করে নিজের প্রতিভাকে তুলে ধরতে পারেন নি কিংবা লোকে সেভাবে তাকে appreciate করতে পারে নি, মূল্যায়ন করতে পারেনি but the fact remains that , post Rabindra - Najrul era ওরকম একটা সাংগীতিক প্রতিভা আমাদের সারা বাংলাদেশে আর জন্মায়নি। সলিল বাবুর কাজ করবার যে ধারা , সেটা আর সক্কলের চেয়ে এক্কেবারে আলাদা কি অপূর্ব তার scanning , কি অপূর্ব তার ভাবনা চিন্তা ! উনি খুব ভালো রকম western music হয়তো শেখেননি ঠিকই , কিন্তু পরে এই নিয়ে উনি যেরকম research করেছেন এবং ওঁর যেরকম গভীর observation ছিল , তাতে কিছু কিছু western influence সলিলবাবুর উপর পড়েছিল এই সমস্ত কিছুকে exploit করে, তাতে melody create করে সলিলবাবু যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন ওটা purely সলিল ঘরানা। আর সবকিছুর থেকে বড় কথা সলিলবাবুর লেখার হাত। মাঝে মাঝেই উনি আমাকে কবিতা পড় শোনাতেন। বলতেন ,- "মান্না দা একটা কবিতা লিখেছি শুনুন।" আহাঃ বিউটিফুল লেখার হাত। বহু লোকের গানই তো গেয়েছি এবং শুনেছি কিন্তু সলিলবাবুর গান আমাকে যত influence করেছে ,তেমনটা আর কারো লেখাতেই হইনি।

সলিলবাবুর নেতৃত্বে বম্বেতে আমরা তখন Bombay youth choir বলে একটা সংস্থা করেছিলাম। তাতে গান বাজনার মধ্য দিয়ে সারা ভারতবর্ষকে এক করবার জন্য আমরা তখন বহু চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সব সময় তো সব কিছু সমানভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠে না , আমাদের প্রচেষ্টাও একদিন মুখ থুবড়ে পড়ল। ভেঙ্গে গেল সেই সংস্থা। জীবনের ঘাত- প্রতিঘাতে আমরাও সব ছিটকে চলে গেছি কে কোথায়। একমাত্র রুমাই বোধ হয় Calcutta youth choir এর মধ্য দিয়ে এখনো বাঁচিয়ে

Deba Prasad Das

রেখেছে আমাদের সেই স্বপ্ন। রুমা তখন বম্বেতেই ছিল এবং আমাদের ঐ Bombay youth choir এর সাথে বিশেষভাবেই যুক্ত ছিল। Bombay youth choir ভেঙ্গে যাবার পর ঐ idea নিয়েই কলকাতায়ও শুরু করেছিল আজকের Calcutta youth choir. Bombay youth choir এর শরিক হয়ে একদিন যদিও গনজাগরণ ইত্যাদির স্বপ্ন দেখতাম, সলিল বাবুর সুরেই যদিও একদিন সোৎসাহেই গেয়েছিলাম 'ধন্য আমি জন্মেছি মা' বা 'মানবো না এ বন্ধনে' র মতো জনপ্রিয় গনসংগীতগুলো, কিন্তু এই সব করে সেই সব মূল সমস্যার কতটা কি সুরাহা করেছি, সেই গণ আন্দোলনের আদৌ কতটা শরিক হতে পেরেছি আমি বা আমরা সেটা বোধ হয় সত্যিই খুব ভাববার মতো ঘটনা।

'দো বিঘা জমিন' রে পর বিমল রায়েরই আরো কিছু কিছু ছবি যেমন 'মধুমতী', 'কাবুলিওয়ালা' ইত্যাদি বেশ কিছু ছবিতেও সলিলবাবু আমাকে দিয়ে তখন গান গাইয়েছিলেন। সেই পঞ্চাশের দশকেই সলিলবাবুর সুরে রাজকাপুরের বিখ্যাত বাংলা ছবি 'একদিন রাত্রে' তে আমি গেয়েছিলাম সেই গান - 'এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়, ভাই সবই হয়, সব সত্যি সব সত্যি'। খুবই হিট হয়েছিল সেই গানটা। গানটায় লিপ দিয়েছিলেন ছবি বিশ্বাস মহাশয়। উনি আমার কাকার খুবই বিশিষ্ট বন্ধু লোক ছিলেন। আমাকেও ভালোবাসতেন খুবই। একদিন স্টুডিওতে দেখা হতেই বল্লেন, - " আরে মান্না, এটা তুমি কি করেছো ? গানের মধ্যে এরকম সমস্ত বেলেল্লাপনা করেছো ! আমি এ গানে লিপ দেবো কি করে শুনি ! " আরো একটু সহজ করে গাইতে পারলে না গানটা!" সত্যিই খুব ভালো গান হয়েছিল ওটা। এরপর তো সলিলবাবুর সুরে 'ঝুলা', 'সঙ্গত', 'আনন্দ' ইত্যাদি বহু ছবিতেই আমি গেয়েছি এবং সে সব গান হয়তো খুবই হিটও হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মালয়ালাম ছবি 'চেমিন' এ উনি আমাকে দিয়ে যে গানটা গাইয়েছিলেন, সেই - 'মানস মইনেবরু, মধুরম্ নুল্লি তেরু', সেটা সারা কেরালায় সেদিন যেভাবে ঝড় বইয়ে দিয়েছিল, তার সমকক্ষ জনপ্রিয়তা বোধ হয় আমার কোন গানই আর কোনদিন পায়নি। জনপ্রিয়তা মানে কি, শ্রোতাদের মুখে মুখে ফিরতে ফিরতে সেই গান প্রায় জাতীয় সংগীতের মতো প্রত্যেক মালয়ালির তখন মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। শ্রেষ্ঠ সুরকার এবং শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে সলিলবাবু এবং আমি দুজনেই কেরালা সরকারের state award ও পেয়েছিলাম সে বছর।

এ্যাওয়ার্ডের কথা বলতেই একটা বিশেষ গানের কথা কেন জানি না আজ এই মূহুর্তে হঠাৎই খুব মনে পড়ছে। মনোজকুমারের ছবি 'উপকার' এ প্রাণের লিপে আমি একটা খুব সিরিয়াস গান গেয়েছিলাম তখন, - " কস্‌মে বাদে প্যার বাফা সব, বাতে হ্যাঁয়, বাতোঁকা ক্যা। কোঁই কিসী কা নহী ইয়ে ঝুঠে, নাতে হ্যাঁয় নাতোঁ কা ক্যা। " যেমন meaningful গান লিখেছিলেন গীতিকার ইন্দিবর, তেমনই ভালো সুর করেছিল বিখ্যাত সুরকার জুটি কল্যানজী -আনন্দজী। ছবিটা যখন রিলিজ হল, তখন সবাই

খুব বলাবলি করছিল যে গত অন্তত পাঁচ বছরে এরকম একটা অসাধারণ গান বম্বে ইন্ডাস্ট্রিতে তৈরী হয় নি। এ গান এবার বছরের সেরা গানের পুরস্কার অবশ্যই পাবেই পাবে। কিন্তু আশ্চর্য , পুরস্কারের নির্বাচনী বোর্ডে সে বছর যাদেরকে রাখা হয়েছিল , এই গানটা সেদিন আদৌ তাদের চোখেই পড়ল না ! এদেশের award গুলো সম্পর্কে এমনিতেই আমার একটু এলার্জী ছিল , তার ওপর এইসব দেখে শুনে ধীরে ধীরে খুবই বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছি এই সব এ্যাওয়ার্ড গুলোর ওপর তথা এই সব এ্যাওয়ার্ডের নির্বাচনী কমিটির সেই সব বিশেষজ্ঞদের ওপর। এমনকি পদ্মশ্রী , পদ্মভূষণ সম্পর্কেও আমার ধারনা বোধ হয় খুব একটা উঁচু মানের নয়। ভাবা যায় , সারাজীবন ধরে যে লোকটা ওভাবে হিন্দী এবং বাংলা গানের সেবা করে গেলেন , এই সেদিন মারা যাওয়ার মাত্র কিছুদিন আগে সেই হেমন্তবাবুকে পদ্মশ্রী দেয়ার কথা কর্মকর্ত্তাদের মাথায় এসেছিল ! পদ্মশ্রীর মান যেভাবে নেমে গেছে , তাতে নিজেকে পদ্মশ্রী বলতেও আজ আমার ভীষণ লজ্জা করে। শ্রুতিকটু হলেও সত্য যে আমাকে সেদিন সরকার পক্ষ থেকে যে মানপত্রটা দেয়া হয়েছিল , ধূলোর আড়ালে আর পাঁচটা আজে বাজে কাগজের ভীড় থেকে সেটাকে খুঁজে বের করতে লালবাজারের ডগ্ স্কোয়াডের লোকজনদেরকেও বোধ হয় আজ হিমসিম খেয়ে যেতে হবে।

'উপকার ' ছাড়া আরও বহু ছবিতেই কল্যানজী - আনন্দজী আমাকে দিয়ে বহু গান , বিশেষত বহু রোমান্টিক গান সে সময় করিয়ে ছিলেন , যার মধ্যে 'মহল' এর ' তুম প্যার করতো এ্যায়সে ','হাসিনা মান যায়েগী ' র 'মেরে মেহেবুব মুঝকো' এসব গানের কথা তো বিশেষভাবেই বলতে হয়। কিন্তু এসব কিছুকেও ছাপিয়ে ওদের সুরে গাওয়া যে গানগুলো শেষপর্যন্ত কালোত্তীর্ণ হিসেবে আজ চিহ্নিত, তার মধ্যে ' জঞ্জীর' ছবিতে প্রাণের লিপে গাওয়া ' ইয়ারি হ্যায় ইমান মেরা ইয়ার মেরি জিন্দেগী ' বা ' লাওয়ারিশ ' ছবির 'জিসকা কোই নেহি উসকাতো খুদা হ্যায় ইয়ারো'' ইত্যাদি গানগুলো বোধ হয় বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

বম্বের সংগীত জগতে এত এত দিকপাল সংগীত পরিচালকরা সব এসেছেন এবং তাদের creation এর মধ্যে এত বৈচিত্র্য ছিল , এত different flavour এর গান ওঁরা আমাকে দিয়ে করিয়েছেন, সেক্ষেত্রে কাকে ছেড়ে কার কথা বলি। আমি প্লে-ব্যাক সিংগিং এ এসেছি সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছরেরওবেশী। গত এই পঞ্চাশ বছরে অরুন কুমার , রবীন্দ্র জৈন , চিত্রগুপ্ত . রবিজী , খৈয়াম, ও . পি. নায়ার , রোশন ,প্রমুখ যত সংগীত পরিচালকদের সুরে আমি এ পর্যন্ত গেয়েছি ,নিজ নিজ ক্ষেত্রে তারা প্রত্যেকেই খুবই নামী লোক এবং তাদের প্রত্যেকের প্রতিই আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু আমার দেখা এই সব মহান সংগীত পরিচালকদের গত সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সেই বিস্তৃত ইতিহাস যদি এখানে বলতে যাই ,তাদের creation এর যদি analysis করতে যাই , তাতে বোধহয় আর একখানা

মহাভারত হয়ে যেতে পারে। So rich ,so different was their observation , their creation. যেমন নৌশাদজী। নৌশাদজীর creation এর মধ্যে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত এবং উত্তর প্রদেশের লোক সংগীত যেভাবে পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে এসেছে , এককথায় সেটা লা জবাব , -এর কোন তুলনা হয়না। আর গান বাজনার জন্য সেকি লগন , সে কি dedication। কোন গানকে সেই রকম ভালো লাগার পর্যায়ে পৌঁছে দিতে তার সেকি আপ্রাণ প্রচেষ্টা, আজকালকার সুরকাররা বোধহয় সেসব কথা কল্পনাই করতে পারবে না। এক একটা গান নিয়ে দশ-পনেরো দিন ধরে রিহার্সাল তো করাতেনই . কিন্তু তারচেয়েও বলবার মতো ব্যাপার হল ওঁর রেকর্ডিং করার ঘটনা। গায়ক বা গায়িকা যত নামীই হন না কেন , এক একটা গানের দশ-বারোটার কম টেক উনি বোধহয় কোনদিনই করেননি । তারপর সবাই চলে গেলে পর স্টুডিওর নিরালা ঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা নিবিষ্ট মনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতেন প্রত্যেকটা টেক। এবং সেই দশ-বারোটা final take এর থেকেই he used to choose the finest . নৌশাদজীর সুরে ' মাদার ইন্ডিয়া ' ছবির 'চুন্দরিয়া কাটতি জায়েরে ,' ''দুখ ভরে দিন বীতেরে ভইয়া'' 'পাল্কী 'ছবির 'মেরে ঘরসে প্যার কি পাল্কী চলি গই '', 'শবাব'ছবির 'ভগৎ কে বসমে হ্যাঁয়'' ইত্যাদি গান গেয়ে সত্যিই সেদিন আমি খুব তৃপ্তি পেয়ে ছিলাম।

নৌশাদজীর কথা বলতে গেলেই পাশাপাশি মদন মোহনজীর নামটাও বোধহয় স্বাভাবিক ভাবেই মুখে এসে যায়। Classical music এর সাথে উত্তর প্রদেশের folk music কে মিলিয়ে মিশিয়ে একটা নতুন ধারার পথিকৃত যদি হন নৌশাদ সাহাব, সেক্ষেত্রে classical music এর সাথে পাঞ্জাবি folk মিশিয়ে একেবারে অন্য একটা ধারা তৈরীর কৃতিত্ব অবশ্যই মদন মোহনজীর প্রাপ্য। মদন মোহনজীর সুরে আমি প্রথম গান গেয়েছিলাম বোধহয় অমিয় চক্রবর্ত্তীর ছবির ঐ ' দেখ কবিরা রোয়া ' তে, বোধহয় সেটা '৫২ কি '৫৩ সনের কথা। 'দেখ কবিরা রোয়া'য় গীতিকার রাজিন্দর কীশনের লেখা ' কৌন আয়া মেরে মনকে দ্বারে ' এবং 'বৈরান হো গাঈ রৈন ' দুটো গানই সেই সময় খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 'দেখ কবিরা রোয়া'র ঐ মধ্য পঞ্চাশেই 'সুহাগন ' এবং ' আখরি দাও ' ছবিতে ওঁর সুরে গাওয়া আমার ও লতার দ্বৈত গীত 'ভিগি চান্দনি 'এবং ও চাঁন্দ মুসকায়া ' খুবই পপুলার হয়েছিল। এর পর তো 'হিন্দুস্থান কি কসম ' ছবির গজলাঙ্গের গান 'হরতরফ অব ইয়েহি আফসানে হ্যায় ' থেকে শুরু করে 'দিল কি রাহে ' তে একেবারে রাগ মালার মতো pure classical পর্যন্ত বহুধরনের গানই আমাকে দিয়ে উনি গাইয়েছেন। মদন মোহনজীর গান মানেই সে একটা একেবারেই অন্যধরণের মজা , যেটা অন্যকারো সুরেই আর কোনদিন কোনভাবেই পাওয়া সম্ভব নয়।

বম্বে এমন একটা জায়গা যেখানে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রান্তের শিল্পক্ষেত্রে সব বাছা বাছা বাঘা বাঘা ব্যক্তিত্বরা এসে সমবেত হন। প্রত্যেক

প্রান্তের প্রকৃতিতে মানুষের জীবন যাত্রায় যেমন একটা বৈচিত্র্য থাকে তেমনি গানের সুরে , তার application এ, তার নোট্স নেয়ার তরিকাতেও একটা সুস্পষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় ।বসন্ত দেশাই এর সুরে যে একটা মারাঠী ফ্লেভার থাকে , ভূপেন-হাজারিকার সুরে সেটা থাকেনা । আবার ভূপেন হাজারিকার সুরে যে একটা অসমীয়া সুরের অন্য রকম রঙ থাকে , অবিনাশ ভ্যাসজীর সুরে সেটা থাকে না । আবার অবিনাশজীর সুরে যে একটা গুজরাতী flavour থাকে গোলাম হায়দারের সুরে যে একটা পঞ্জাবী সুরের রঙ বাহার থাকে , হেমন্ত মুখার্জীর সুরে সেই flavour খুঁজতে যাওয়া বৃথা । বম্বে ফিল্ডের এই যে একটা বিশাল ব্যাপ্তি, এই যে একটা নানারঙের মেলা সেই রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নিতে পারাটাই বোধহয় আমার বম্বেতে কাজ করার সবচেয়ে বড় পাওয়া ।বম্বেতে না গেলে আমি হয়তো একটি কূপমন্ডুক হয়েই থেকে যেতাম । জীবনের এত বৈচিত্র্য , সুরের এত রঙ বাহার সে বোধহয় কোন দিনই আমার আর দেখাই হত না ।

আমার এই ৫০ বছরের সঙ্গীত জীবনে যত সঙ্গীত পরিচালককে আজ পর্যন্ত আমি দেখেছি , যত সঙ্গীত পরিচালকের সাথে আমি কাজ করেছি, গান গেয়েছি , সেই সুদীর্ঘ তালিকার শেষ তম মহান সংগীতকার নিঃসন্দেহে পঞ্চম অর্থাৎ রাহুল দেব বর্মন । পঞ্চমের পর যারা এই ইন্ডাষ্ট্রিতে এসেছে তাদের কারো মধ্যেই সেই অরিজিনালিটিটা আমি খুঁজে পাইনি , যেটা পঞ্চমের মধ্যেই পুরো মাত্রায়ই ছিল । সলিল চৌধুরী বা পঞ্চম এরাও পাশ্চাত্য সংগীত নিয়ে যথেষ্টই কাজ করেছেন ঠিকই কিন্তু প্রাচ্য - পাশ্চাত্যের সুরের মেল বন্ধনে তাদের যে একটা মুন্সিয়ানা ছিল , বিদেশী সুরের আশ্রয় নিয়েও গানটা কে শেষ পর্যন্ত যে ভাবে তারা পুরোমাত্রায় ভারতীয় গান করে তুলতেন, তেমনটা আজকের কোন সংগীতকারের কাজের মধ্যেই আমি খুঁজে পাইনা । সলিল চৌধুরী বা পঞ্চমের সৃষ্টির সাথে আজকের সংগীতকারদের সৃষ্টির পার্থক্য বোধ হয় একমাত্র পেন্টিং এবং জেরক্স এর পার্থক্যের সাথেই তুল্য হতে পারে ।

বয়সে অনেক ছোট হলেও শুরু থেকেই পঞ্চম আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্থানীয় ছিল । ওর সুরে পতিপত্নী, পরায়াধন , অভিলাষা, ওয়ারিশ এরকম বহু ছবিতেই বহু গান আমি তখন গেয়েছি । ওর সুরের মধ্যে যে একটা অন্যরকমের বৈচিত্র্য থাকতো , দেখে আমি খুবই অবাক হয়ে যেতাম । বৈচিত্র্যের দিক থেকে ওকে আমি ওর বাবার চেয়েও অনেক ক্ষমতাবান বলেই মনে করি । যতদূর মনে পড়ছে পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে মেহমুদের 'ছোটে নবাব ' ছবির সংগীত পরিচালক হিসেবেই বোধহয় পঞ্চম প্রথম বম্বে ইন্ডাষ্ট্রিতে আত্ম-প্রকাশ করে । তবে R.D Burman বলতেই অন্য রকম যে একটা splendorous image পলকেই আমাদের মনের ক্যানভাসে উঁকি দিয়ে যায়, সেই break টা ও প্রথম বোধহয় পেয়েছিল 'তিসরি মঞ্জিল ' ছবিতে সুপারব্ সুর করার পর । খ্যাতিমান লোকদের ছেলেমেয়েদের কে স্বভাবতই যে একধরনের সমস্যার মুখোমুখি

হতে হয় , S.D Burman এর ছেলে হিসেবে পঞ্চমকেও ক্যারিয়ার শুরুর দিনগুলোয় দাঁতে দাঁত চেপে সেই সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। প্রথম প্রথম ও যখন সত্যি সত্যিই নিজের প্রতিভা দিয়ে ভালো ভালো সুর করে ভালো নামটাম করে ,তখন আশেপাশে সবাই খুব বলতো যে " এতে রাহুলের আবার প্রশংসা পাবার কি আছে ! এতো আসলে শচীন কর্ত্তারই সুর , ঐ সুরই তো রাহুল নিজের নামে চালিয়ে দিচ্ছে ! " এসব গুলো শুনে শুনে রাহুল তখন মনে মনে ভীষণ দুঃখ পেত। তখনি ওর মধ্যে একটা জেদ চেপে গিয়েছিল , তখনি ও ভাবতে লাগলো যে সুরের ক্ষেত্রে এমন কিছু করে দেখাতে হবে যাতে S.D .Burman এর ছেলে হিসেবে তার পরিচয় নয় , R.D .Burman এর বাবা হিসেবে শচীন কর্ত্তার একদিন পরিচিতি হয়। সেই ভাবনা, সেই জেদ থেকে অচিরেই জন্ম নিল S.D. Burman এর ছায়ামূর্তি স্বাধীন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব -R.D Burman যার আশ্চর্য সুন্দর ছোঁয়ায় হিন্দী ফিল্মী সংগীতের ধারাটাই সেদিন বদলে গিয়েছিল। হিন্দী ফিল্মী-মিউজিকের ইতিহাসে পঞ্চমের সবচেয়ে বড় অবদান নিঃসন্দেহে western beats এর প্রবর্ত্তন।

'ভূত বাংলা ' ছবিতে পঞ্চম আমাকে দিয়ে খুব সুন্দর একটা গান করিয়ে ছিল -"আও টুইস্ট করে গা উঠা মৌসম।" তখনকার জমানার খুবই হিট গান ছিল ওটা। প্রথমে ঠিক হয়েছিল যে ওটা রফিকে দিয়ে গাওয়ানো হবে। কিন্তু পঞ্চম শুনে বলে , - " অসম্ভব। তা কি করে হয় ! ক্যায়সে গায়েঙ্গে সব western notes !" এর মধ্যে আরও কি সব ঝুট ঝামেলাও যেন তখন ছিল। তখন পঞ্চম বল্লে যে , " নেহি ম্যায় সির্ফ মান্না দা সে হি গাওয়াউঙ্গা ইয়ে গানা ।" যাই হোক , ওদের ঝামেলা টামেলা মিটে যাওয়ার পর ঠিক হল যে আমাকে দিয়েই গাওয়ানো হবে ঐ গান। সে সময় চাবি চেকার (Chubby Checker) বলে আমেরিকাতে একজন নাম করা গাইয়ে ছিলেন তারই বিখ্যাত গান 'come let us twist ' যে ভেঙ্গেই পঞ্চম বানিয়ে ছিল ' আও টুইস্ট করে .....'। রিহার্সালের সময় original record টাও এনে একদিন আমাকে শোনালে। Western music এর জন্য প্রথম থেকেই তো আমার একটু অন্যরকম weakness ছিলই , চাবি চাকারের গানটা শুনে, তার থেকে কিছু কিছু জিনিস incorporate করে তাকে Indianise করে গেয়েও দিলাম সেই গান। খুবই জনপ্রিয়ও হ'ল সেই গান। কিন্তু 'come let us twist' এবং 'আও টুইস্ট করে ' গানদুটো পাশাপাশি শুনলেই সহজেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে পঞ্চমের আসল মুন্সিয়ানাটা কোথায় এবং সেটা কত অর্থবহ । শুধু western style এর গানই নয় ইন্ডিয়ান স্টাইলের গান তাও আবার একেবারে রাগ ভিত্তিক গানেও পঞ্চম সমান ভাবেই সার্থক। 'বুঢ্ঢা মিল গয়া'তে আয়ো কাহাসে ঘনশ্যাম ,' 'মেহবুবা ' তে রাজেশ খান্নার লিপে "গোরি তোরি প্যায়জনিয়া " ইত্যাদি গান গুলো যত সার্থকভাবে পঞ্চম আমাকে দিয়ে সেদিন গাইয়েছিল, সেই পর্যায়ের গান আমিও

বোধহয় সারাজীবনে খুব বেশী একটা গাইনি , গাওয়া হয়নি।

একটা সময় ছিল যখন ছবিতে মেহমুদের লিপে কোন গান থাকা মানেই অবধারিত ভাবেই সেটা হত আমার গান। সংগীত পরিচালক যে-ই হন না কেন , মেহমুদ আগে থেকেই বলে দিত যে আমার গান আমি মান্না দাদাকে ছাড়া অন্য কাউকে দিয়েই গাওয়াবোনা। '' দাদা মুঝকো যিতনা সমঝতে হ্যায় ,যিতনা সমঝকে গানে গাতে হ্যায়, উতনা ঔর কিসিসে ভি নেহি হোতা ''। বাস্তবে সত্যি সত্যিই আমি ওকে কতটা বুঝেছি বা ওরজন্য কতটা কি গাইতে পেরেছি আমি জানিনা , কিন্তু আমার গানের ও যেরকম picturisation করেছে , এককথায় সেটা অনবদ্য। ওর লিপে ' জিদ্দির ' র সেই ''প্যার কি আগমে তনবদন জল গয়া'' গানটা তো আমার হিসেবে হিন্দী ফিল্মের ইতিহাসেই একটা আদর্শ পিকচারাইজেশন হয়ে আছে। তো সেই মেহমুদ যখন ওর 'পড়োশন ' ছবিটা তৈরী করে , তখনও obviously I was the first choice to playback for him এবং আমিও এক কথায়ই ওর জন্য গাইতে রাজী হয়ে গেলাম কিন্তু যখনই শুনলাম যে ছবিতে কিশোর কুমারেরও একটা full fledged role আছে , এবং -ওর সাথেই আমাকে গাইতে হবে। আমি সাবধান হয়ে গেলাম। কারণ কিশোর গান গাইবে মানেই গেয়ে একেবারে ফাটিয়ে দেবে। বিশেষত আমার যেধরনের গলার টিম্বার , আমি যেভাবে গান-বাজনা করি তাতে ওর ঐরকম ভরাট গলার গানের কাছে আমার গান যে কমজোর হয়ে যাবে ! ওর সাথে ডুয়েট গাওয়া আমার জীবনের সে এক অদ্ভুত রকমের অভিজ্ঞতা। আমার মনে আছে লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের সুরে ''আমীর গরিব '' ছবিতে আমাদের একটা ডুয়েট ছিল - '' মেরে প্যালে মে শরাব ডালদে ফির দেখ তমাশা ''। ঐ 'প্যালে মে শরাব' কথা গুলোয় লক্ষ্মীকান্ত যে গুঁড়ো গুঁড়ো কাজ ঢুকিয়ে ছিল , তখন সেইটিই সুরে মজিয়ে মজিয়ে আমার গায়কী মতো গেয়ে দিলাম। সেই শুনে লক্ষ্মী তো খুশীতে একেবারে ডগমগ। বারবার বলতে লাগলো -বাঃ মান্না দা বাঃ কেয়া কামাল কর দিয়া আপনে '' খুব তারিফ করলো আমার। এবার কিশোরের গাইবার পালা। কিশোর ওঁর ঐ অননুকরণীয় স্টাইলে শুরু করলো - ' তেরে চেহেরেপে ......,তেরে চেহেরে পে নকাব ডাল ফির দেখ্ তমাশা , ও তেরে চেহেরেপে ...., আমি যে সব সুরের কাজটাজ লাগিয়ে ছিলাম,সেই সবের ধার কাছ দিয়েই ওঁ গেলনা। তখন লক্ষ্মীকান্ত , বল্লে,-'কিশোরদা , কিশোরদা মান্নাদা য্যায়সে গা রহে হ্যাঁয় , ঐসেহি গাইয়ে না ,,- জরা শুনিয়ে , জরা সুরকা মজা লেকে গাইয়ে না , একবার দুবার এরকম বলবার পর কিশোর বল্লে ,- ''দেখো লক্ষ্মী, তুমকো অগর সুরকা মজা উজা লেনা হ্যায় তো তুম মান্নাদা সে হি গাওয়ালো , ম্যায় ঘর চলতা হুঁ। অগর মুঝসেভি তুম গাওয়ানা চাহতে হো তো, ম্যায় য্যায়সে গা রহা হু , এ্যায়সে হি গাউঙ্গা।'' বললে বিশ্বাস হবে না ছবিটা রিলিজ হবার পর পর্দায় যখন ঐ গানের দৃশ্যটা দেখলাম , তাতে আমার যে

গানের স্টাইল, আমাদের গান-বাজনার ঐযে সুরের মজা , ওসবগুলো ওর গানের সামনে সব যেন একেবারে ফিকে পড়ে গেল , ঐ যে ওঁর গলার একটা roundness , ঐরকম একটা throwing , তাতে ওঁ যখন গাইছে " তেরে চেহেরে পে নকাব ডাল ফির দেখ তমাশা " তখন মনে হচ্ছে যেন গোটা screen টা জুড়ে কিছু একটা এসে বম্ব করে একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়ে গেল । এই হচ্ছে কিশোর কুমারের আসলি বৈশিষ্ট । ঐ যে জন্মগত একটা আশ্চর্য রকম গলা , ঐ দিয়েই আর সবাইকে সেদিন সে একেবারে মেরে দিয়েছিল । রফি মিঞার মতো ওরকম একজন complete গায়ককে পর্যন্ত কিশোর একেবারে কাৎ করে দিয়েছিল একমাত্র ঐ গলার জোরে । ক্ষেমচাঁদ প্রকাশের সুরে ওঁ যখন মুকদ্দর ছবিতে প্রথম গান গাইতে আসে তখনই আমরা সবাই বুঝে গিয়েছিলাম যে প্রতিভার দ্যুতিতে ইন্ডাস্ট্রিতে এ একদিন ধুন্ধুমার কান্ড ঘটিয়ে ছেড়ে দেবে । I used to be totally mad about him ওর মতো একটা versatile talent এদেশে খুব কমই জন্মেছে। যেমন ছিল ওর গানের গলা , তেমনই অতুলনীয় ছিল ওর অভিনয় । যারা 'দূর গগনকি ছাঁওমে ,' " চলতি কা নাম গাড়ী " বা ' পড়োশন ' ইত্যাদি ছবিতে ওর সেই দুর্ধর্ষ অভিনয় দেখেছেন ,তারাই বুঝতে পারবেন যে অভিনেতা হিসেবে ও কিশোর কুমারের প্রতিভা কত বড় মাপের ছিল ।

যা হোক ,' পড়োশন ' ছবিটা করার সময় মেহমুদ যখন ওর লিপে গান করবার জন্য আমাকে ডেকে নিল এবং যখন শুনলাম যে শুধু একক গানই নয় , কিশোরের সাথে আমাকে একটা ডুয়েট গানও গাইতে হবে , তখন ছবির সংগীত পরিচালক পঞ্চমকে ডেকে আমি একদিন বল্লাম - "পঞ্চম , তুমি যখন আমার গানটায় সুরটুর করবে তখন আমাকেও একটু ডেকে নিও । আমিও তোমার সঙ্গে এসে বসব এবং ভালোকরে রিহার্সাল করে তারপরই আমি গানটা রেকর্ড করব ।" পঞ্চম বল্লে - 'ঠিক আছে দাদা , তাই হবে ।"তখন পঞ্চম একটা গান বানালো - "এক চতুর নার করকে সিঙ্গার মেরে মন কে দ্বার মে ঘুসত জাত ......" । সবাই শুনে বল্লে যে-মান্নাদা আর কিশোরের ডুয়েট , সে ভীষণ ব্যাপার । রাম - রাবণের যুদ্ধ হবে এবার । যেদিন গানটার রেকর্ডিং হল , সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা । সকাল ন'টায় আমরা রেকর্ডিং আরম্ভ করলাম আর শেষ হল গিয়ে প্রায় রাত্রি ন'টা নাগাদ । সেই দেখেছিলাম কিশোরের গানের versatility ! ওঁ যা গেয়েছিল না ,- অপূর্ব , শুনে লোকেরা তখন বলেছিল ,-'দেখো, দো রঙ্ দেখো, দো খুব সুরতি দেখো । এক তরফ মান্নাদা যব গাতে হ্যাঁয় তো লগতা হ্যায় কি কোই আদমি গানেমে তপস্যা কর রহে হ্যাঁয় । ঔর দুসরি তরফ দেখো কিশোরেজীকো ,কিতনা natural গানা গা রহে হ্যাঁয় । Really Kishore's is a natural talent , everything used to come to him so naturally . ও তো কোনদিনই রেয়াজই করেনি , কিন্তু ওর ঐ গলা ! ঐ দিয়েই তো মেরে দিয়েছে । যারা গান

বাজনা জানে ,যারা সুরের কারুকার্য ভালোবাসে তারা হয়তো বলবে যে - "বাঃ , মান্না দা গাইছে দেখেছো , কি রকম সুরে ডুবে গাইছে ,কি রকম সুরেলা এক্সপ্রেশন দিচ্ছে !" তারা হয়তো সেই কথাটাই ভাবছে , কিন্তু by and large যারা the common man , তারা তো কিশোরের গলার ঐ আওয়াজ শুনেই একেবারে পাগল হয়ে যাচ্ছে। That is the thing . যে কারণেই কিশোরের ঐ over powering talent টা আমি মন থেকে , সেদিন মেনে নিয়ে ছিলাম,I was compelled to believe that -"চলতি কা নাম হি গাড়ী,"- যুগের হাওয়ায় যা চলে লোকে সেটারই জয় জয় করে।

অনেকেরই একটা ধারণা আছে যে যোগ্যতার মানদন্ডে সংগীত জগতে আমার যা সম্মান , যা প্রতিপত্তি পাওনা ছিল , আমি নাকি আদৌ তা পাইনি। সংগীত পরিচালকরা নাকি এব্যাপারে আমার প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করেছেন , আমাকে নাকি তাঁরা সেভাবে সুযোগই দেননি , যেভাবে রফি , কিশোর বা মুকেশ কে দিয়েছেন। মানে আমাকে যারা ভালোবাসেন ,আমার গানকে যারা ভালোবাসেন , বিশেষত তাদেরই অনেকের মধ্যেই এই রকম একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। বম্বের এবং কলকাতার কিছু কিছু কাগজেও কখনো কখনো এরকম ধারণা প্রকাশিত হতে আমি দেখেছি। হয়তো তাদের মধ্যে এরকম একটা ধারণা তৈরী হওয়ার কারণ এই যে রফি , কিশোর বা মুকেশের তুলনায় আমার গানের সংখ্যা কম এবং সংগীত পরিচালকরা নায়কদের মুখে ওদেরকে দিয়ে যত রোমান্টিক গান গাইয়েছেন , সেই তুলনায় তেমন রোমান্টিক গান সত্যিই আমি হয়তো খুব বেশী একটা গাইনি। কিন্তু আমার এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার গানের প্রিয় শ্রোতারা কিছুটা অন্ধ ভালোবাসা নিয়ে যেভাবে আমাকে বম্বে ইন্ডাষ্ট্রির বঞ্চনার শিকার বলে প্রায়ই একধরনের উষ্মা মিশ্রিত সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন practically it is not like that at all , বরং উল্টো আমারই সব সময়ই শুধু মনে হয়েছে যে আমার যতটা যোগ্যতা ,তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী স্বীকৃতি , সম্মান বিনা আয়াশেই আমি পেয়ে গিয়েছি। যদি সত্যি সত্যিই সে রকম স্বীকৃতি না পাওয়া , সম্মান না পাওয়া কোন talented শিল্পীর কথা বলতেই হয় , তবে বলতে হয় G.M Durani র কথা , রাজকুমারীর কথা , বলতে হয় ঐ রকমেই আরো অনেক শিল্পীর কথা । কি সব দুর্ধর্ষ গাইয়ে ছিলেন এঁরা। এঁদের সামনে গাইতে আমারই লজ্জা হত। অথচ কি আশ্চর্য সে ভাবে এঁরা নামই করতে পারলেন না কোনদিন। আসলে প্রতিভা থাকাটাই বোধহয় প্রতিষ্ঠা পাওয়ার শেষ কথা নয়। যোগাযোগ এবং সেই সঙ্গে commercial attitude থাকাটাও বোধহয় প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য অবশ্যই একটা major factor . আমার অনেক সৌভাগ্য যে যৎসামান্য প্রতিভা তো ভেতরে ছিলই , সেই সঙ্গে প্রায় দশ-বছর অপেক্ষা করার পর যোগাযোগটাও হঠাৎ ই সত্যি সত্যিই একদিন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন

যোগাযোগটা হল, বোধহয় একটু বেশীই দেরী হয়ে গেছে।

হিন্দী সিনেমা জগৎ সম্পর্কে যাদেরই একটু-আধটু ধারণা আছে, তারাই জানেন যে হিন্দী সিনেমার, হিন্দী সিনেমার গানের নাচের , মানে এককথায় সিনেমার A to Z সবকিছুর একটা ফর্মূলা থাকে। সেই ফর্মূলা মতোই সিনেমা গুলো তৈরী হয় এবং সেই ফর্মূলার পরোক্ষভাবে নির্ভর করে আমাদের মতো আপামর গায়ক-গায়িকাদের ভাগ্যের ওঠা - নামা। কারণ আমাদের একমাত্র পরিচয় , আমরা -playback singer .অর্থাৎ আমরা গান-গাই একমাত্র সিনেমারই কোন না কোন ক্যারেক্টারের লিপে ক্যারেক্টাররা আবার প্রত্যক্ষভাবেই সিনেমার ঐ বিশেষ ফর্মূলাজাত product। এরপরের factor হচ্ছে ফর্মূলা অনুযায়ী সবসময়ই হিন্দী সিনেমায় গানের কিছু কোটা থাকে , যেমন হিরো কটা গান গাইবে , ভিলেন কটা গান গাইবে , কমেডিয়ান কটা গান গাইবে , হিরোয়িন কটা গান গাইবে , বিরহের গান কটা থাকবে , প্রত্যেক সিনেমায়ই এর কিছু specified কোটা থাকে । কিন্তু আমার যখন যোগাযোগটা হ'ল তখন ঐ সব specified কোটার সবই প্রায় already booked হয়ে গেছে। প্রেমের গান মানেই তালাত মামুদ গাইবে , দুঃখের গান মানেই মুকেশ গাইবে এবং একটু চ্যাংরামি একটু লম্ফঝম্ফের গান হলেই সেটা কিশোর অথবা রফি গাইবে , সুরকার -শ্রোতা - দর্শক সবার মধ্যেই তখন ওরকম একটা craze তৈরী হয়ে গিয়েছিল। এর বাইরে কেউ তখন নতুন করে ভাবতে পারতেন না , তার ওপর সিনেমার আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে , এটাকে যতই মহান শিল্প বলে উল্লেখ করা হোক না কেন , মূলত এটাতো পুরোমাত্রায় একটি পণ্য এবং এটাতো পাবলিককে খাওয়ানোর, মানে বাজারে চালানোর একটা ব্যাপার আছে , সে ক্ষেত্রে যে অভিনেতার লিপে যে গায়ক বা গায়িকার প্লেব্যাক একবার হিট্ হয়ে যায় , অর্থের মানদন্ডে বক্স অফিসে সাফল্য পায় , সেটাকে ভেঙ্গে সেই লিপে অন্য কোন নেপথ্য গায়ককে ঢুকিয়ে কোটি টাকা লগ্নীকৃত বানিজ্যে মার খাওয়ার ঝুঁকিটা এরা কোনদিনই তেমন ভাবে নিতে চায়না , নেয়া সম্ভবও নয় আমার সময় যারা সিনেমার ঐসব পপুলার লিপগুলো already book করে ফেলেছিল গানের জগতে তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি মহীরুহ। তাদেরকে হটিয়ে দিয়ে কক্ষে পাওয়া , সেটা মোটেও সহজসাধ্য ছিলনা। এক্ষেত্রে প্রতিভার চেয়েও বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল জুটি craze এবং আরো কিছু আনুসঙ্গিক ব্যাপার যেমন মুকেশ এবং রাজকাপুরের সুপার হিট জুটি। যদিও ঐ পঞ্চাশের দশকেই 'শ্রী ৪২০' ইত্যাদি ছবিতে শঙ্কর -জয়কিষেন খুব successfully prove করে দিয়েছিলেন যে রাজসাহেবের লিপে আমার গান মুকেশের চেয়ে বেশী বৈ কম মানানসই নয়, কিন্তু ঐ যে একটা made for each other craze , ঐ যে রাজসাহেবের সাথে মুকেশের বহুদিনের একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব , ঐ সমস্ত কিছু মিলিয়েই সংগীত পরিচালকদের এত শুভ প্রচেষ্টা সত্বেও ওখানে আমি নাকই গলাতে পারিনি

কোন দিন। জুটি craze টা কখনো কখনো এমনো হয়েছে যে , hero রা নিজেরাও কখনো কখনো বলে দিতেন যে- তার লিপে যেন ওমুক গায়কের গানই একমাত্র দেয়া হয়। যেমন ছবিতে মেহমুদের লিপে কোন গান থাকলেই মেহমুদ সরাসরি আমার নাম propose করতেন।

মুকেশের পরেই এসে যায় রফি র কথা।"দিন ঢল্ যায়ে হায়, রাত না যায়ে " বা " আজা প্যারে পাস্ হমারে কাহে ঘাবড়ায়ে" ইত্যাদি গান রফি যেভাবে গাইত, যত অর্থবাহী ভাবে গাইতো , তখন , সেই বয়সে আমাকে দিয়ে সেই গান গাওয়ালে কোনভাবেই সেই গানে সেই dimension টা আমি দিতেই পারতাম না। এটা fact। কারণ গানের কথার মধ্যে রফির ঐযে expression, শত চেষ্টা করলেও ঐ expression আমার গলায় তখন আসতো না আসা সম্ভবও ছিলনা। এর একটা প্রধান সমস্যা ছিল -ভাষা। ভাষার সেই ব্যবধানটা তখনও আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারিনি। যে কারণেই বাংলায় যত রোমান্টিক গান আমি গাইতে পেরেছি ভাষার advantage পেয়ে, হিন্দীতে সেটা পারিনি বললেই চলে। যিনি ডাইরেক্টর, যিনি প্রযোজকের কোটি টাকা লগ্নী করে মুনাফার আশা নিয়ে পণ্যটা তৈরী করছেন, তিনি তো best জিনিষটাই choose করবেনই। এটাকে বঞ্চনা ভাববার তো কোন মানে হয় না। জীবনের সর্বত্রই তো অস্তিত্ব রক্ষার সেই একই সূত্র survival of the fittest ., গান -বাজনার ক্ষেত্রেও, যে fittest ,সেই এখানে যুঝতে পেরেছে , টিকতে পেরেছে। বাকীরা সব ছিটকে গেছে। অস্তিত্ব রক্ষার এই 'fittest' তত্ত্বের জন্যই লতা মঙ্গেশকরের কাছে ভীষণ ভাবে মার খেয়ে গেছে বাণী জয়রাম বা সুমন কল্যানপুরের মতো অসামান্য প্রতিভাময়ী শিল্পীরা , এই 'fittest ' তত্ত্বের জন্যেই হেমন্ত- উত্তম জুটির জগতে প্রথম দিকে আমি entry ই পাইনি। কিন্তু আমার কোনদিনই মনে হয়নি যে সংগীত জগতে আমি সংগীত-কারদের বঞ্চনার শিকার। Because always I tried to think everything in a practical manner . I tried to get to the bottom of the problem. আমি দেখেছি যে ফিল্মী গানের fitness এর দিক থেকে যে দিকটায় আমার সত্যি সত্যিই একটু আধটু ব্যুৎপত্তি ছিল অর্থাৎ ফিল্মী classical গায়নের ব্যুৎপত্তি, সেখানে রফি ঐ ধরনের গান খুবই ভালো গাইতে পারলেও fittest তত্ত্বের বিচারে সে ক্ষেত্রে সংগীতকার সব সময় চোখ বন্ধ করে একমাত্র আমাকেই সুযোগ দিয়েছেন , রফি বা মুকেশকে কোনদিনই নয়। তার ওপর কাকার প্রতিনিধি হিসেবে যে ধরনের গান গেয়ে আমি হিন্দী ফিল্মীগানের জগতে entry নিয়েছিলাম , সামান্য নাম করেছিলাম , স্বাভাবিক ভাবেই সে ধরণের গানে আমি তখন একেবারে stamped হয়ে গিয়েছিলাম। তবে হ্যাঁ , যদি আরও একটু চেষ্টা চরিত্র করতাম , যদি আরও একটু কমার্শিয়াল হতে পারতাম , যদি অন্য শিল্পীদের মতো দিনের পর দিন সংগীত কার দের বাড়ীতে গিয়ে ধর্না দিতে পারতাম, গান গাওয়ানোর জন্য অনুরোধ করতে পারতাম , হয়তো তাতে আমার

গানের সংখ্যার আরও সামান্য বৃদ্ধি হলেও হতে পারত কিন্তু আমি যা গেঁতো লোক তাতে ঐ রকম চেষ্টা চরিত্র কোনদিনই আমি করে উঠতে পারিনি ,নিজের মন থেকে কোনদিন সায় পাইনি কারণ আমাদের ফ্যামিলিতে কাউকেই তেমন কাজ করতে কোনদিনই আমি দেখেনি।

এভাবেই এগিয়ে গেছে একটি একটি করে জীবনের চুয়াত্তরটি বছর। স্মৃতির ঝুলিতেও সঞ্চিত হয়েছে কত না মজার অভিজ্ঞতার নানান রঙের স্মৃতি। যে স্মৃতির সরণি বেয়ে আমার শিল্পী মন অনায়াসেই পোঁছে যায় জীবনের সেই সব ফেলে আসা মিষ্টি মধুর দিনে। যে স্মৃতি জীবনের আজ এই অপরাহ্ন বেলায় থেকে থেকেই মনের মণিকোঠায় উঁকি দিয়ে যায় , মনে হয় গানের চেয়েও মধুর গানের আড়ালের সেই সব মিষ্টি স্মৃতি , যে সব স্মৃতি H M V র রেকর্ডে কোনদিনই ধরা পড়েনি অথচ মনের মরচে পড়া গ্রামোফোনটায় সামান্য আবেগের দম দিলেই একেবারে সেদিনের মতোই কত জীবন্ত হয়ে বাজতে থাকে গানের আড়ালের ধূলোপড়া সেইসব রেকর্ড গুলো। নিজের মনেই আমি একা একা সেই শুনি,শুনে মজা পাই। যেন একান্ত ভাবেই ফিরে পাই সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোকে। অথচ অন্যরা তো দূর ,আমার চারপাশের আপনজনেরাও হয়তো আমার মনের সেই মরচে পড়া গ্রামাফোন। ধূলোয় ঢাকা সেই সব ঢাউস রেকর্ডগুলোর কোনদিনই নাগাল পায়নি। ফেলে আসা দিনের কথা বলতে বলতে কেন জানিনা সেরকমই একটা রেকর্ড আজ হঠাৎ মনের গ্রামোফোনে নিজে থেকেই অবিরাম বেজে চলেছে।

বহু দিন আগের কথা। গুরু মুভিজ এর ব্যানারে 'লহু পুকারেগা ' বলে বম্বেতে তখন একটা ছবি হয়েছিল , যাতে নায়ক ছিলেন সুনীল দত্ত এবং সংগীত পরিচালনা করেছিলেন বিখ্যাত কাকা- ভাইপো জুটি - সোনিক-ওমি। সোনিক-ওমি সুরে 'শঙ্করদাদা''ভুখ','অপনা খুন' এরকম বেশ কিছু ছবিতেই তখন আমি অনেকগুলো গান গেয়েছিলাম। 'লহু পুকারেগা ' ছবিতেও সুনীল দত্তের লিপে আমাকে দিয়ে ওরা তখন খুবই ভালো একটা গান করিয়ে ছিল,- "ইয়ে হিচ্‌কি শরাব কি নেহি......কিসিনে মুঝে ইয়াদ কিয়া হ্যায় ...." ইত্যাদি ইত্যাদি। খুবই দুঃখের গান ছিল ওটা। সুনীল দত্ত তাঁর হারিয়ে যাওয়া ভাইকে পাগলের মতো সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছে আর গাইছে-'ইয়ে হিঁচকি শরাব কি নেহি .....'এই যে হিঁচকি শরাবের হিঁচকি নয়, এ নিশ্চয় আমার হারিয়ে যাওয়া ভাইই আমাকে স্মরণ করছে , সে কারণেই আমার হিঁচকি উঠছে। খুবই দুঃখের গান। কিন্তু সেবার হল কি ওরা যখন এই গানটা গাইবার জন্য আমার কাছে অফার নিয়ে এলো, বেশ কয়েকদিন ধরেই আমি তখন অসহ্য দাঁতের ব্যাথায় কাতরাচ্ছিলাম। তাই ওমিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল্লাম যে ভাই দেখো,দাঁত ব্যাথায় কযেকদিন ধরেই আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি , তুমি বরং কয়েকদিন বাদে গানটার রেকর্ডিং এ ডেট করো। ততদিনে আমি আশা করি সুস্থ হয়ে যাবো। আর নয়তো এযাত্রায় অন্যকাউকে দিয়েই গানটা করিয়ে নাও। ওমি বল্লে,- দাদা,হমলোগ ঔর

কিসিসে ভি নেহি লেঙ্গে ইয়ে গানা। ঔর সুনীলজী কে লিয়ে সির্ফ আপকোহি গানে পড়েগা ইয়ে গানা। রেকর্ডিং ঔর ইস গানেকা সুটিং, দোনোকা হি date fixed হো গয়া। তো য্যায়সে ভি হো,আপকো গানাহি পড়েগা ইয়ে গানা।”কি আর করি,অগত্যা রাজী হয়ে গেলাম। এবং বাড়ীতে বসেই ওরা আমাকে গানটা তুলে দিয়ে বেশ কয়েকদিন রিহার্সাল ইত্যাদি করালো। দাঁতব্যাথা সামান্য কিছু থাকলেও সবমিলিয়ে এই কয়দিন মোটামুটি বেশ ভালোই যাচ্ছিল। কিন্তু রেকর্ডিং এর আগের দিন সন্ধেবেলা থেকে আমার দাঁত ব্যাথাটা এত প্রচন্ড বেড়ে গেল যে রের্কর্ডিং ফেকর্ডিং সব যেন একেবারে ভেস্তে যাবার উপক্রম। অসহ্য যন্ত্রণায় সারারাত একটুও ঘুমোতে পারলাম না। খুবই একটা বিচ্ছিরি পরিস্থিতি হয়ে গেল। যাই হোক,clove oil টয়েল লাগিয়ে সকালের দিকে শেষপর্যন্ত ব্যাথাটার যখন একটু উপশম মতো হ'ল,তখন ঐ অবস্থাতেই নির্ধারিত সময়মতো সকাল ন'টা নাগাদ আমি স্টুডিওতে চলে গেলাম। যন্ত্রীদের সাথে ফাইনাল রিহার্সাল ইত্যাদি করার পর ফার্স্ট টেকটা দেয়ার জন্য আমি যখন micro-phone এ গেলাম, তখন বেলা গড়িয়ে প্রায় দুপুর আড়াইটে মতো বাজে। রিহার্সাল করার সময়তো মোটামুটি বেশ ভালোই ছিলাম , কিন্তু গানটার ফার্স্ট টেকটা যখন শুরু করতে যাবো,তখন হঠাৎই আবার শুরু হয়ে গেল সেই দাঁত ব্যথা। দাঁত ব্যথা মানে কি, সে একেবারে অসহ্য রকম ব্যথা। অথচ রেকর্ডিস্ট কৌশিক সাহাব,সমস্ত যন্ত্রীরা সবাই তখন একেবারে রেডি। এই অবস্থায় ওখান থেকে বের হয়ে আসাটাও তখন খুবই অশোভন লাগছিল। অগত্যা ব্যথার কথা বলে ওদের কে অপ্রস্তুত না করে ঐ ভাবেই গানটা শুরু করে দিলাম। কিন্তু গাইতে গিয়ে যতই মুখের ভেতরটায় নাড়াচাড়া হচ্ছিল, ততই ব্যথাটাও যেন ক্রমেই অসহ্যতর হয়ে উঠতে লাগলো। এত ব্যথা হচ্ছিল যে ব্যাথায় আমার চোখ দিয়ে তখন ঝর ঝর করে জল পড়তে শুরু করে দিয়েছে। অথচ মাঝখানে গানটা ছাড়তেও পারছিলাম না তখন। অবশেষে কোনমতে গানটা শেষ করেই সোজা একটা চেয়ারে এসে চুপচাপ বসে পড়লাম। চারধারে কেমন একটা থমথমে ভাব কারো মুখেই কোন কথা নেই ,সব কেমন চুপচাপ। হঠাৎ দেখি সোনিক ভেতর থেকে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে গালে একটা চুমু খেয়ে আবেগাপ্লুত ধরা ধরা গলায় বলতে লাগলো ,-“বাঃ দাদা বাঃ ! কেয়া গায়া আপনে দাদা,কামাল করদিয়া। আপকে আখোঁমে আঁসু !কিতনে রো রহে হ্যায় আপ,আ হা হা ঃ !”মানে আমার চোখে জল দেখে ওরা ভাবলো যে ঐরকম একটা দুঃখের গান গাইতে গাইতে আমি বুঝি নিজেকে আর সামলাতে পারিনি,সে কারণেই আমি বুঝি কেঁদে একেবারে ভাসিয়ে দিচ্ছি ! কিন্তু কি করে আমি তখন ওকে বোঝাই যে সোনিক,- এ কান্না আসলে সেই কান্না নয়, এটা আসলে অন্য জিনিসের কান্না !- সোনিকের সহমর্মী কপোল কল্পনাকে উপহাস করে আমার কপোল বেয়ে তখন ও অঝোরে গড়িয়ে পড়ছে সেই দাঁত ব্যথারই চোখের জল !